ছিটমহলের ভূমি

শচীন দাশ

মন বড়োই খারাপ আজ খালেকের। খালেক মিঞার। আবার আনন্দও যে এক-আধটু হচ্ছে না তা নয়। কিন্তু সে আনন্দ যেন বাসি আকন্দের মতোই ফিকে একটা গন্ধ ছড়িয়েই মিলিয়ে যাচ্ছিল। আর মাত্র কটা দিন। তারপরেই তো তাদের পুনর্জন্ম হবে। প্রায় ঊনসত্তর বছরের পরাধীনতার জ্বালা ঘুচবে। ছেলেবেলা থেকেই যে ছিটমহলের অন্ধকারে বড়ো হয়ে উঠেছিল তারা সেই ছিটমহলই এবারে মিশে যাবে ভারতের সঙ্গে। এবং এই এবারেই এতবছর বাদে তারা পাবে এক বৃহৎ ভূখণ্ডের নাগরিকত্ব। সেই দেশের সুযোগসুবিধে। আর এই নিয়ে কী কম মিছিলমিটিং করেছে তারা? যৌবন থেকেই ছিটমহল সমন্বয় কমিটির প্রায় প্রতিটি সভায় উপস্থিত থেকেছে খালেক। থেকে কখনো-কখনো তার ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছে আবার কখনও বা সুচিন্তিত মতামতও জানিয়েছে। কিন্তু জানালেও যৌবন পার হয়ে প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে বার্ধক্যে এসেও কোন দিশা দেখতে পায়নি। জানত, জীবন তাদের এই অন্ধকারেই থেকে থেকে একসময় শেষ হয়ে যাবে। শেষও হয়ে যাচ্ছিল। এই সময়েই ছিটমহলগুলো যেন নড়েচড়ে উঠল। নাড়াল তাদের প্রতিবেশি দুই দেশের মানসিকতা ও নেতৃত্বের সদিচ্ছা। ভারত ও বাংলাদেশ।

আলোচনা চলছিল কিছুদিন ধরেই। অবশেষে আলোর মুখ দেখল। দুই দেশের মোট একশো বাষট্টিটা ছিটমহলের মধ্যে একশো এগারোটাই ভারতের ও বাংলাদেশের একান্নটি। মোট বাহান্ন হাজার মানুষ বাস করে এখানে। আবার ছিটের মধ্যেও ছিট রয়েছে। তা এগুলিকে বার করে এনে দু-দেশের মধ্যে সঠিক বিনিময় করে দিলে বোধহয় মানুষগুলো প্রাণে বাঁচবে। এমন দাবি নিয়ে গত পঞ্চাশ বছরে কত যে দরবার করেছে খালেকরা। কিন্তু কিছুই হয়নি এতবছর ধরে। তবে সমস্যাটা বরাবরই তুলে ধরেছে। আজ যৌবন গিয়ে বার্ধক্যে এসে এই এবারেই বোধহয় সে সমস্যাটা মিটতে চলেছে। ছিটমহলগুলি মিশে যাচ্ছে ভারত ও বাংলাদেশের সঙ্গে। দুই দেশের সরকারি কর্মকর্তারা নাকি সম্প্রতি ছিটমহলগুলিতে এসেছেন ও এসে যৌথভাবে জরিপ চালাচ্ছেন। এখন ছিটমহলের বাসিন্দাদের নাম নথিভুক্ত করবে তারা। এবং কে কোনদিকে যেতে চায় তাও জানার চেষ্টা করবে। আর এসব হয়ে গেলেই যে যার ছিটমহলগুলোকে নিয়ে নেবে তাদের সঙ্গে। আর মাত্র কটা দিন! তারপরেই তো তারা বলতে পারবে যে যার দেশের নাম। পাবে নাগরিকতা। পাবে তাদের বাচ্চাদের স্কুলে পড়ানোর সুযোগ। পাবে ভোটাধিকারের অধিকার, হাতে আসবে বি.পি.এল. কার্ড আর আধার কার্ড। পাবে চিকিৎসা ও পারবে উন্মুক্ত ডানা মেলে নিশ্চিন্তে এধারে-ওধারে ওড়ার ক্ষমতা।

খালেক উঠল। আজকাল আর চোখে দেখে না কিছুই সে। সবই ঝাপসা। কানেও যেন শোনে কম। তাবাদে উঠে দাঁড়াতে গেলেই পা-জোড়া টলমল করে। খালেক তাই বসেই থাকে সারাদিন। অথবা মনে হলে কখনো-কখনো শোওয়া।

কাছাকাছি থাকে তার এক মেয়ে। দুই মেয়ের মধ্যে বড়ো। বিয়ে হয়েছে কাছেই। সে-ই এসে সকালে খাবারটা দিয়ে যায়। দুপুরের রান্নাটাও করে দিয়ে যায়। একা মানুষ খালেক। তাও আবার বয়স হয়েছে। কী-ই বা খায়! ওই দুটি ভাত ও সঙ্গে একটু সবজি। বা কোনোকোনোদিন এক-আধফালি মাছও। কিংবা ডিমের ঝোল। তাও খালেক বারণ করেছিল। জানিয়েছিল তারটা না হয় সে নিজেই করে নেবে। তা শোনেনি বড়ো মেয়ে সাবিনা। উঠতে-বসতে যে টাল খায় ও চোখে দেখে না সে কিনা করবে নিজের রান্নাটা! মৃদু ধমকে বসিয়েই দিয়েছিল সে তার বাপকে। খালেকও আর কিছু বলেনি। কী বলবে! সে তো জানে, তার সময় এসেছে গোরে যাবার। আজকাল প্রায়ই সে টের পায় বুকের ভেতরের খাঁচা থেকে ওই অচিন পাখিটা বেরিয়ে আসার জন্য ছটফট করছে। কখন যে একসময় ঢুকেছিল। ঢুকে আর বেরোতে পারেনি অনেকদিন। এখন যেন সুযোগ পেয়েই উঁকিঝুঁকি মারছে। জানে খালেক, সুযোগ একটা পেলেই ফস করে আবার বেরিয়েও যাবে যে কোনও মুহূর্তেই।

খালেক উঠে দাঁড়ায়। বড়ো পেচ্ছাপে ধরেছে। এই এক রোগ হয়েছে আজকাল। ঘনঘন পেচ্ছাপ। উঠবে উঠছে করে করে অনেকক্ষণই উঠতে পারেনি। ফলে অণ্ডকোশদুটো যেন বেলের মতো ফুলে উঠেছে। এখন না উঠলে কী জানি কখন লুঙি ভাসিয়ে ফেলে।

পা বাড়াল খালেক। ধরে ধরে এটা ওটায় হাত রেখে রেখে ঘরের পেছনের দিকে ঝোপটায় গিয়ে বসে পড়ল। আর বসেই অনেকক্ষণ ধরে পেচ্ছাপ।

ও চাচা, চাচা—

খালেক চমকে ওঠে। কে ডাকছে বুঝি খালেককে। বেশ চেঁচিয়েই ডাকছে। খালেকের কানে গেল তা। এবং পেচ্ছাপে বসেই খালেক একটু সাড়া দিল। জানাল এই আসছে সে।

বদনায় জল নিয়ে গিয়েছিল। পেচ্ছাপ করে জল দিয়ে ধুয়ে উঠে দাঁড়াল ফের খালেক। আর ওই তখনই তার মাথা টলমল। সামনের বাঁশের বেড়াটা ধরে খালেক নিজেকে সামলে নিল। পরে বদনাটা রেখে আস্তে আস্তে ওই বারান্দায়। একদিকের হাতল ভাঙা ওই কাঠের চেয়ারটায় গিয়ে বসল।

চাচা, আমরা আইছিলাম—

কেডা তোমরা? খালেক হাত তোলে চোখের ওপরে। দুপুরের রোদটা একটু তেরচা হয়ে বারান্দায় পড়েছে। তাতেই চোখে যেন একটু ধাঁধাঁ লাগছে।

আমরা ছিটমহল সমন্বয় সমিতির লোকজন। অঘোরদায় পাঠাইল—

ও হো। তা কও, কী কইবা—

কইত্যাছি আমাগো ছিটমহলে জরিপের কাম কিন্তু শ্যাষ হইয়্যা গেছে। দুই দ্যাশের সরকারি কর্মকর্তারা আইয়্যা মাস খানেক ধইর‍্যা জরিপের কাম করল। অহনে নাম নথিভুক্ত করনের কাম। ভারত থিকা অফিসাররা আইছে। বাংলাদ্যাশ থিকাও আইছে। ঘরে ঘরে আইয়্যা অহনে বেবাকের নামধাম নথিভুক্ত কইর‍্যা লইব। আপনে কই যাইতে চান তাও জিগাইব—

কই যামু মানে?

মানে আপনারে একখান সুযোগ দিব। জিগাইব আপনে ভারতের লগে থাকবেন না বাংলাদ্যাশের লগে—

ও, আইচ্ছা হেইয়্যা জিগাইব?

হ, জিগাইব না ক্যান? আপনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার দাম দিব না হেরা—

তইলে কী কমু আমি কও তো?

কী কইবেন তা আপনে তো ভালা কইর‍্যা জানেন খালেক চাচা। ছিটমহল লইয়্যা তো যৌবন থিকাই আন্দোলন করলেন ... কইবেন আপনে যেহানে থাকতে চান। যেহানে আপনের মন চায়। আর হ, আপনের পোলামাইয়্যা কথা জিগাইলে হেগো নামও দিবেন কিলাম—

পোলামাইয়্যা! আবু চমকে উঠল।

পোলা বলতে তো তার ওই একটাই। ছেলে মনসুর। তা সে ছেলে তো কবেই চলে গিয়েছে। বাপের সঙ্গে আর সম্পর্কই নেই। তা রহিমা তখনও বেঁচে। গোরে যায়নি। সেই কোন বছর পনেরোর সময় ছেলের লেখাপড়ার জন্য দেলোয়ার হোসেনের হাতে তুলে দিয়েছিল ওকে। তারপরে আর ছেলেকে দেখেনি সে। না সে, না তার বিবি রহিমা। কিন্তু যোগাযোগ ছিল। আসতে না পারলেও দালালের মাধ্যমে বর্ডার থেকে নিয়মিত খবরাখবর পাঠাতো মনসুর। চিরকুটও দিত। খালেককে সবই জানাত। দেলোয়ার হোসেনের হাতে ছেলের পড়ার খরচ-খরচাও তাই পাঠাত খালেক। এই করে করেই একদিন শুনল লেখাপড়ার পর ছেলে তার একটা চাকরি পেয়েছে। খুব শিগগিরই সে আসবে। কিন্তু আসবে আসবে করেও আর আসেনি। চেষ্টা করেও এখন আর ছেলের মুখটা তাই মনে করতে পারে না খালেক মিঞা। অথচ ছেলেকে নিয়ে তার কতই না সাধ ছিল।

ভাবতে গিয়েই খালেক যেন ক্রমশ একটা ঘোরের মধ্যেই চলে যাচ্ছিল।

ছেলে বড়ো হচ্ছে। অথচ লেখাপড়া করানো দরকার। মেয়েদুটোর না হয় বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু পুরুষ মানুষ! পেটে একটু বিদ্যে না থাকলে দাঁড়ায় কী করে! তার জীবন তো শেষ হয়েই এল। তাবাদের জমিজমাও নেই যে চাষ দিয়ে জীবন কাটাবে। পাটগ্রামে যেটুকু তামাক চাষের জমি ছিল তাদের সেখানে আর অন্য কোনো চাষ না হওয়ায় সস্তায় সে জমি কবেই বিক্রি করে দিয়েছিল তার বাপটা। ঝরতি-পড়তি যা ছিল তাতেই চাষ দিয়ে দিয়ে

নিজের জীবন গেছে। পরে দুই মেয়ের বিয়েয় তারও অনেকটাই চলে গিয়েছে। বাকি যা আছে তাতে মাসের খোরাকও ওঠে না। এখন এই ছেলেকে যদি ওই একটু জমির ভরসায় ফেলে রাখে তো বর্ডারে গিয়ে একদিন স্মাগলিং-এ হাত পাকাবে।

চিন্তায় ছিল খালেক। অথচ লেখাপড়ার কোনো ব্যবস্থাই নেই এখানে। পাশের গ্রামে আছে একখানা প্রাইমারি স্কুল। তাও সেটা কাঁটাতারের ওপারে। ইন্ডিয়ার মধ্যে। তবু ওখানেই কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁকফোকর গলে বি এস এফ-এর সঙ্গে লুকোচুরি খেলে কিছুটা পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছিল মনসুর। একদিন আর পারল না। ধরা পড়ে যাওয়ায় লেখাপড়ার ওখানেই ইতি। কিন্তু হলেও ছেলে তা মানবে কেন! পড়াশোনা সে করবেই। লেখাপড়ার স্বাদটা যে পেয়ে গিয়েছে ততদিনে। তাবাদে খালেকেরও জেদ!

খোঁজেই ছিল খালেক। আর পেয়েও গেল একদিন। কাঁটাতারের ওপারে সীমান্তের ওই ভূখণ্ডে পাঠিয়ে ছেলেকে লেখাপড়া করাতে পারবে ঠিকই কিন্তু তার জন্য পরিচয়পত্র লাগবে! ইন্ডিয়ার সিটিজেন হতে হবে। কিন্তু ছিটমহলের ছেলে মনসুর সে পরিচয় পাবে কোথায়! চেষ্টায় ছিল খালেক। অতঃপর তারই চেষ্টায় পরিচিতি একটা জুটল। এক দালালের মাধ্যমে ওই খালেকের সঙ্গেই যোগাযোগ ঘটল দোলোয়ার হোসেনের। সে মনসুরের বাপ হতে রাজি। কিন্তু বিনিময়ে হাজার পাঁচেক টাকা চাই। তা খালেক দিতে রাজি হলেও খালেকের বউ বুঝি বেঁকে বসেছিল সেদিন।

হায় হায়, এইয়্যা কন কী! পোলার বাপের পরিচয় বদলাইয়্যা যাইব? অমন লেহাপড়ার মুহে আগুন—

তা কী করবা? এহানে না আছে স্কুল ... না আছে হাসপাতাল, না কোনো চাকরি ... ওই একফালি জমির ভরসায় পোলাডারে বসাইয়্যা রাখলে তো একদিন বর্ডারে গিয়ে চোরাকারবারে ঢুকব! বিয়াসেফের গুলি না খাইয়া মরে শ্যাষে—

তাই বইল্যা বাপের পরিচয় বদল! আপনে না হের বাপ? আপনে এইডা পারলেন?

তা খালেক যত বোঝায় বউ ততই মাথা নাড়ে। অতঃপর একদিন দুদিন। শেষে একদিন বুঝি নিমরাজি হয় মনসুরের মা। আর রাজি হতেই এক সকালে চলে যায় মনসুর। বর্ডারে দেলোয়ার ছিল সে-ই সব ব্যবস্থা করে দেয়। বিনিময়ে হাজার পাঁচেক টাকা দেয় খালেক। চুক্তিও হয় ছেলের লেখাপড়ার খরচ সে জোগাবে। দেলোয়ার শুধু তার একখানা পরিচয় পত্র জুটিয়ে দিক। তা দিয়েছিল দেলোয়ার। দিয়েছিল শুধু নয়, খালেক মিঞার ছেলের জন্য সাহায্যের হাতও বাড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে সেই যে গেল মনসুর আর এল না। ফলে খালেক যেন ভুলেই গিয়েছিল তাকে। এই এতদিন বাদে হঠাৎ করেই নামটা ভেসে উঠল আবার ভুস করে। আর মনে করিয়ে দিল ওই ছিটমহল সমন্বয় সমিতির ছেলেগুলোই।

ঝাপসা চোখে তাকিয়েছিল। একসময় বলল খালেক, কিন্তু কেমনে কমু। পোলা তো আর আহে নাই বহুকাল। আমার লগে যোগাযোগও নাই—

নাই তো কী হইছে! পোলো তো এখনও আপনের আছে নিকি?

কিন্তু যদি কয় কী করে পোলা—

কইবেন চাষবাস করে ...

না না, হেই পরামর্শ দিয়ো না আমারে।

তয় কী কইবেন?

কমু এক মাইয়্যা আছে। বিয়া দিছি। আর বিবি গেছে গিয়া গোরে ...

ও চাচা, এইয়্যা আবার কী কইলেন? ছুডো মাইয়্যার কথাখান কইবেন না? আপনের কী এক মাইয়্যা নিকি?

এক মাইয়্যা হইব ক্যান? কিন্তু ছুডোটা হেই যে পোলা বিইয়্যাইতে গেল ইন্ডিয়ায় ... বর্ডার পার হইয়্যা ... স্বামীর নাম বদলাইয়্যা ... আর আইল? আইল নিকি! তার চাইয়্যা কমু, দুই মাইয়্যা ছিল ... বিয়া দিয়া দিছি। কী কও তোমরা—

বলতে বলতে হাঁপাচ্ছিল খালেক। একসময় উত্তর না পেয়ে চোখের ওপরে হাত তুলে দেখল উঠোনটা ফাঁকা। কেউই নেই। তাহলে? কারা ওর সঙ্গে কথা বলছিল এতক্ষণ? নাকি সে নিজেই নিজের সঙ্গে বকবক করছিল। কিন্তু গলা তুলল যে চাচা কয়ে—

খালেক তাকাল। শ্রাবণের আকাশ। সকাল থেকেই মেঘে মেঘে ছয়লাপ। দু-একবার গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়লেও মাটি তেমন ভেজেনি। অথচ এখনই তো মাটি ভিজবে মাটি কাদা হবে আর মাটিতে পড়বে লাঙল। তারপর মাটি ভালো করে মিহি হলে বীজতলা থেকে তোলা ধানের গুছি এনে বসাও। একি আব্বা! অহনও এইহানে বইয়্যা আছেন! খান নাই অহনও?

সাবিনা এসেছিল একেবারে শেষবেলার দিকে। এসে তার রান্নাটান্না যা যেমন করেছিল পড়ে থাকতে দেখে খালেককে শুধোয়, খান নাই ক্যান?

অই ওরা আইল ... হেগো লগে কথা কইতে কইতে ...

কারা আইল?

ওই যে। ছিটমহলের পোলাগুলি ... কইল ভারত থিকা নাকি সরকারি কর্তারা আইছে। ঘরে ঘরে আইয়্যা অহনে বেবাকের নামধাম নথিভুক্ত কইর‍্যা লইব। কে কুনহানে থাকতে চায় তাও জিগাইব। তা হেইয়্যা না হয় কইলাম ... কিন্তু কয় কী আপনের পোলামাইয়্যা গো কথা জিগাইলে তাও কইবেন ... আইচ্ছা ক তো দেহি সাবি ... মনসুরে গেছে গিয়া প্রায় পঁচিশ বচ্ছর হইল আর অহনে অরা কয় আমারে ...

সাবিনা অবাক, কারা আইছে ভারত থিকা?

ক্যান তুই হোনস নাই? ছিটমহলগুলির যে বিনিময় হইব এইবারে। ভারত পাইব ভারতের ছিটগুলি ... আর বাংলাদেশ পাইব বাংলাদেশের ছিট ...

সাবিনা দাঁড়িয়েছিল। বারান্দার খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে এবারে বসে পড়ল আস্তে আস্তে। আব্বু বলেটা কী!

সাবিনা জিজ্ঞেস করে, তাই নিকি আব্বু! তাই হেরে দেহি হগাল থিকাই এইহানে ওইহানে যায় ... তইলে আমরা কুনদিকে যামু আব্বু?

আমাগো ছিটগুলি নিব তো ভারতে ... এই ছিটগুলি ভারতের ... ইণ্ডিয়ার। অহনে ভারতের লগে মিইশ্যা গেলে তুই পোলামাইয়্যা গো পড়াইতে পারবি ... হাসপাতালে লইয়্যা যাইতে পারবি ... ভোট দিতে পারবি ... আবার বাংলাদ্যাশে গেলেও হেই সুযোগসুবিধা পাবি। ওই কাঁটাতারখানা আর তোর বাধা হইয়্যা খাড়াইব না। অহনে তুই ইণ্ডিয়ায় থাকতে চাস না বাংলাদ্যাশে হেইয়্যা ভাবতে হইব। আমগো যাওনের অধিকার দুই দ্যাশেই আছে। অহনে তর সোয়ামি যা কইব।

দেখছ কাণ্ড ... এতসব হইয়্যা গেল আর হেয় আমারে কিছুই জানাইল না ...

সাবিনা নিজের স্বামীর দোষ ধরতে থাকে।

খালেক বোঝায়, না না হেয় যা কইব তাই হইব।

ক্যান, আমার পছন্দ যদি না হয় ... তইলে?

তইলে?

খালেক ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

কাছাকাছিই শাদি হয়েছে দুই মেয়ের। একজন এই সাজিরহাটেই। অন্যজন পাটগ্রাম।

ওই পাটগ্রামেই সেসময়ে কিছু জমিজমা ছিল খালেকদের। তামাকের চাষ হত। ইংরেজরা লাইসেন্স দিয়েছিল তার বাপকে তামাক চাষের। বাপটা তামাকের চাষটা দিত ভালো। যেমন বড়ো বড়ো পাতা হত তেমনি পাকা হলে গাঢ় খয়েরি রং। সাহেবরা দেখে খুব প্রশংসা করত। খুবই উৎসাহ দিত খালেকের বাপটাকে। পাতা উঠলে তাই লপ্তে লপ্তে সেসবই তুলে নিয়ে যেত তারা লোক লাগিয়ে। ফলে কিছু টাকা এসেছিল বাপের হাতে। কিন্তু বাপও গেল আর সেসব চাষও গেল শেষ হয়ে। দেশ ততদিনে স্বাধীন হয়ে গিয়েছে। আর ওই ইংরেজরাও ছেড়ে চলে গিয়েছে তাদের। আর যাবার সময়ে ভাগাভাগি করে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দেশটা ভাগ বাটোয়ারা করে দিয়ে গেল। কিন্তু দিতে গিয়ে ভুলে গিয়েছিল এই খণ্ড জায়গাগুলির কথা। ফলে ছিটকে পড়ল তারা।

খালেক শুনেছে, এই জায়গাগুলি ছিল একসময়ে কোচবিহারের মহারাজার। শুনেছিল, মহারাজা কোচের জমিদারির বেশ কিছু অংশ তাঁর রাজ্যের বাইরেও পড়েছিল। এগুলি আসলে এক একটা থানা এলাকা। ইংরেজ শাসনের অবসানের পর অখণ্ড ভারত ভাগের সময় এই অঞ্চলগুলি সেসময়ের পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্যেই থেকে যায়। অথচ কোচবিহার চলে যায় ভারতেরই সঙ্গে। ফলে ভারতেরও কিছু ভূখণ্ড চলে যায় ওদিকে। সেসময়ের পূর্ব-পাকিস্তানে। যা এখন বর্তমানে বাংলাদেশের অধীনে। পাশাপাশি সেসময়ের পূর্ব-পাকিস্তানেরও কিছু অংশ ভারতেরই কাছে চলে আসে। কিন্তু এরা কোনো দেশেরই মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয় না। ফলে ব্রাত্যই থেকে যায়। ফলে চারদিকে কাঁটাতারেরই বেড়া ওই বেড়ার মাঝে শুধু তারা। বেশ কয়েক ঘর ছিটমানুষ। কিন্তু ওদিকে ওই কাঁটার ওপাশে যাওয়ার উপায় নেই।

ওটা বাংলাদেশ। আবার এদিকে এই কাঁটারও ওধারেও পা রাখতে পারবে না তুমি। ওটা আবার ভারত। ইণ্ডিয়া। তা এই দুইয়েরই মাঝে যাঁতাকলে পড়ে চিপসে যাচ্ছিল খালেকরা। বছরের পর বছর। অথচ মাঝের এই জায়গাটুকুর বাইরে কোনোদিনই যেতে পারল না তারা। যেন চারদিকের চার নদীর মাঝে একটু খানি চর।

মাঝেমধ্যে অবশ্য ঢেউ ওঠে। এবং ছিটমহল সমন্বয় কমিটির লোকেরাও মিছিলমিটিং করে। যেমন করে এসেছে একদিন খালেকরা। কিন্তু কিছুই হয়নি। তবে এইবার নাকি সমস্যার সমাধান হবে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ছিটমহলগুলো ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ঠিকঠাক বিনিময় হয়ে যাবে। দুই দেশের মধ্যে নাকি এই নিয়ে আলাপ-আলোচনাও চলছে প্রায়ই। এতদিন খালেকরা তো চেষ্টা করে এসেছে। আর সেই চেষ্টারই ফল বুঝি এবারে ফলতে চলেছে। আর মাস তিনেকের মধ্যেই সব ঠিকঠাক বন্টন হয়ে যাবে। কিন্তু ততদিন যদি খালেক বেঁচে না থাকে?

সন্দেহ হচ্ছিল খালেকের। এই সময়েই ওই ছেলেগুলো। ভারত থেকে নাকি সরকারি কর্মকর্তারা সব এসে পড়েছে।

শুনতে শুনতে আর খেয়াল ছিল না সাবিনার। আচমকা কী মনে পড়ে গেল। সাবিনা উঠল তখন চটপট।

কিন্তু হেইয়্যার লাইগ্যা আপনে খাইবেন না? ম্যাঘে ম্যাঘে যে বেলা বাড়ল হেই খেয়ালও নাই। লন দেহি। খাইয়্যা লন আগে—

বারান্দা থেকে ঘরে নিয়ে গিয়ে সাবিনা খাওয়ায় তার বাপকে। তারপর ফের বারান্দায় এনে বসায়।

সাবিনা জিজ্ঞেস করে, শুইবেন একটু?

না না, অরা আইব আবার অহনি ... কইয়্যা তো গেল—

কী ভেবে সাবিনা ঘরের ভেতরে যায়। বাপের এঁটোবাসনগুলো একবার ধুয়ে রাখা দরকার।

বাসনকোসন ধুয়ে রাখছিল সাবিনা এই সময়েই কানে এল বাপ যেন কার সঙ্গে কথা বলছে। কারা এল আবার? সাবিনা ঘর ছেড়ে বারান্দায় আসে।

ও আব্বু কার লগে কথা কন—

ক্যান অরা আইল যে!

কই আইল?

চোখের ওপরে হাত একটা তোলে খালেক।

সাবিনা কী বোঝে। পরে জানায়, আমি তইলে আহি। রাতে আইয়্যা দুধ আর খই দিয়া খামু না হয়—

না না। খালেক হাত নাড়ে, আমার ক্ষুধা নাই। অবেলার খাওয়া—

সাবিনা তবু জানায়, আইচ্ছা আইচ্ছা সে দেহন যাইবখন। আপনে কিন্তু আর এইহানে বইয়্যা থাকবেন না। বদলার পানি ... বুকে ঠাণ্ডা বইয়্যা যাইব—

হ্যারিকেন একখান জ্বালাইয়্যা দিয়া যামু?

না না, আমি পারুম। মিছামিছি ত্যাল পুড়াইয়্যা লাভ কী—

তয় সাঁজের আগেই ঘরে যাইয়েন গিয়া।

হ হ, যামু।

সাবিনা নেমে যায়। এ কাজটা তার রোজকার। বয়স হয়েছে তার বাপের। আশিও কবে পার। এখন চোখে নেই কান নেই কেবল রয়েছে ওই স্মৃতিখানি।

সেই স্মৃতি নিয়েই মনের গভীরে আবারও ডুবল খালেক।

সাবিনা এসেছিল একবার। হ্যারিকেন জ্বালিয়ে বিছানাটা ঠিক করে বিছানায় তুলে দিয়েছিল। তারপর খিদে নেই জেনে আর জোরাজুরি করল না। তবে হ্যারিকেনটা ডিম করে রাখল ঘরের এক কোনে। এরপর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

আমি যাই আব্বা। দরজাটা বন্ধ কইর‍্যা দিয়েন—

হ হ, দিমু নে।

সাবিনা বেরিয়ে যায়। আর সে বেরোতেই খালেক ওঠে। বাদলার রাত। কে জানে কহন আবার হুড়মুড়াইয়্যা লামে। নামলে তো দরজাটা হাওয়ায় বারি খাইব। পানির ঝাপটাও আইব ঘরের ভিতরে ...

আস্তে ধীরে নেমে দরজার দিকে এগিয়ে যায় খালেক। কিন্তু দরজাটা বন্ধ করতে গিয়েই একি! আবারও সেই ছেলেগুলো?

চাচা, কাইল কিন্তু হগাল হগাল আইব সরকারি কর্তারা। আইজ কইয়্যা গেছে—

কাইলই আইব?

হ।

কিন্তু ...

কিন্তুর কী ... আপনে কইবেন আপনের ইচ্ছাডা। কই থাকতে চান আপনে—

তা না হয় কমু তয় পোলার কথাটা কিন্তু কইতে পারুম না—

ঠিক আছে আপনের যা মনে লয় তাই কইয়েন ... শুধু মনে করাইয়্যা দিয়া গেলাম কাইল ভোর ভোর সুম আইব কিলাম সরকারি কর্তারা। গত দুই দিন বদলার লাখান কাম করতে পারে নাই—

পায়ে পায়ে এগিয়ে বারান্দায় কাঠের ভাঙা চেয়ারটা টেনে বসে খালেক। আর বসতে না বসতেই টের পায় বাইরে যেন একটা ঝাপসা আলো। আজ কি শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা নাকি! মেঘ না থাকায় বুঝি মেঘের আড়াল থেকে উঁকি মারতে শুরু করেছে। তাবাদে বাতাসেও বুঝি একটা মিঠাভাব। কী একখান পাখি বুঝি ডাকে থেমে থেমে।

খালেক চুপ করে বসে থাকে। বসে বসে ওই পাখির ডাকটা শুনতে থাকে। আর ভাবে, কাল তো তারা আসবে বলেছে কিন্তু কার সঙ্গে থাকবে সে। যাবে কুনহানে?

ভাবছিল বসে খালেক। আর ভাবতে না ভাবতেই চোখের পাতা কখন জুড়ে এল। একহাতে একদিকের চেয়ারের হাতলের ওপর ভর দিয়ে বসে রইল খালেক।

ভোর হল। রাতের দিকে বোধহয় বৃষ্টি হয়েছিল। বেশ ভারি বাদলা। ওই তাতেই বারান্দা ভিজিয়ে খালেকের চেয়ার ভিজিয়ে খালেককেও সে ভিজিয়ে কাঁচা মাটির বারান্দাটা চপচপে করে রেখেছে। উঠলে পা হড়কায়।

ও চাচা! খালেক চাচা আছেন নিকি—

বলতে না বলতেই কারা ঢোকে। ওই তো চাচা! বসে রয়েছে চেয়ারের ওপরে।

স্যার, উনি ... উনার কথাই বলছিলাম। এই ছিটমহলগুলির জন্য আজীবন লড়াই করে এসেছেন। কিন্তু এখন বয়স হয়েছে। চোখে দেখেন না কানে শোনেন না ... কিন্তু তবুও কী উৎসাহ!

তা কে কে আছে ওর। উনি এখন কোথায় থাকতে চান?

দেখি ওনাকে জিজ্ঞেস করে—

কাদা পার হয়ে জল-ছপছপে উঠোন পার হয়ে এসে ওরা ওঠে।

চাচা, ও খালেক চাচা, দেখো কারা আইছে—

খালেক চুপ। খালেকের তাতেও কোনো সাড়া নেই। সে তেমনি চোখ বুজে কী ভাবছে।

ও চাচা, স্যার জিজ্ঞেস করছেন আপনে এখন কোথায় যাবেন ... কার সঙ্গে থাকবেন?

স্ট্রেঞ্জ! সকালের হাওয়ায় দেখুন ঘুমিয়ে পড়েছেন বোধহয়। সুগার আছে নাকি—

ও চাচা!

কে একজন উঠে আসে এবারে। এবং এসেই খালেকের গায়ে হাত একটা রাখে। আর ওই তাতেই চেয়ার উল্টে পড়ে যায় খালেক। এরপর বারান্দায় পড়ে গড়াতে গড়াতে একবারে সেই উঠোনে।

চাচা!

কে একজন দৌড়ে যায়। কিন্তু সরকারি কর্তাটি বাধা দেন।

থাক থাক, ওকে এখন আর ডাকবেন না? কেউ থাকলে বরং খবর দিন। ততক্ষণে ছিটমহলের এই মাটিতেই উনি শুয়ে থাকুন খানিকটা সময়।